গল্প

বিচার - আহমেদ সাবের

নৌকায় উঠার পর থেকেই কুলসুম ঘ্যন ঘ্যন করছে, আমি বাজানের কাছে যামু, আমি বাজানের কাছে যামু।

ছোট নৌকার এক গাদা ভিড়ের মধ্যে রমজান কোন মতে ফাতেমা আর কুলসুমকে উঠিয়ে দিয়ে যখন বোচকা-বুচকি নিয়ে নিজে উঠতে গেল, নৌকার লোকজন হইচই করে উঠলো-

কর কি মিয়া? তুমি কি আমাগো সবাইরে ডুবাইয়া মারতে চাও নাকি? পরের ক্ষেপে আস।

নৌকায় তিল ধরনের যায়গা নেই যে আরেকটা লোক উঠবে। তার উপর, রমজানের হাতে বিরাট দুটো বোচকা। অগত্যা রমজানের আর উঠা হলো না। নৌকা ছেড়ে দিল ওকে ছাড়াই।

আমি পরের ক্ষেপে আইতাছি। তোমরা ঘাটে বইসা থাইকো। এদিক সেদিক যাইওনা। ফাতেমাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলে রমজান।

ফাতেমা শুকনো মুখে বলে, থাকুম।

নৌকাটা যাচ্ছে তারাগঞ্জ।

ফাতেমার কিছুটা ভয় যে লাগছেনা, তা না। একা একা এতদুর পথ। তবে, সাথে কুলসুম আছে, আর তারাগঞ্জ যায়গাটা ওর একেবারে অচেনা না। তারাগঞ্জের পাশেই আশাখালি। ওর বড় বোন রোকেয়ার বিয়ে হয়েছে সেখানে। ছোটবেলায় কত এসেছে। ঘাট থেকে মাইল তিনেকের পথ। দরকার পড়লে বুবুর বাড়ী চলে গেলেই হবে। কপাল ভাল হলে ওদের গ্রামের কাউকে গঞ্জে পেয়েও যেতে পারে।

দশ বছরের কুলসুমের মুখটা শুকিয়ে আমসি। বাজান আইলো না ক্যান? বাজানরে ফালাইয়া আইলা ক্যান? আমি বাজানের কাছে যামু।

সেই যে শুরু করেছে, আর থামার যো নেই।

উজান ঠেলে নৌকা চলছে। ভট ভট করে ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে। পানিতে টইটুম্বুর ভাদ্রমাসের নদী। নৌকার উপর ধার প্রায় প্রায় ছুই ছুই করে ঢেউ গুলো ছুটে চলছে । একটু হেললেই পানি ঢুকে পড়ছে নৌকায়। একজন পানি সেচে চলছেতো চলছেই। নদীর পাড়ে কাশ ফুলের মেলা।

কলকলি দ্যাখ, কেমন সোন্দর কাশ ফুল। কুলসুমকে কাশ ফুল দেখায় ফাতেমা। কুলসুমকে ওর বাবা-মা আদর করে কলকলি বলে ডাকে। সারাক্ষন বকবক কারে বলে, নাম হয়ে গেছে কলকলি।

আমি বাজানের কাছে যামু। আমি বাজানের কাছে যামু। কুলসুম আর থামেনা।

নৌকাটা যেন চলছে তো চলছেই। সময় যেন আর কাটতে চায়না। মাথার উপর গনগনে সূর্য্য। ফাতেমা তাকিয়ে দেখে, কুলসুমরে মুখ ঘামে চকচক করছে। শাড়ীর আঁচলটা ওর মাথার উপর টেনে ধরে ফাতেমা।

কতক্ষন সময় কেটেছে কে জানে, যেন অনন্ত কাল। শেষমেশ নদীর একটা বাঁক ঘুরতেই তারাগঞ্জের পাটের কলটা ফাতেমার চোখের উপর লাফিয়ে পড়ে।

কলকলি, আমরা আইসা গেছি। দ্যাখ, ঐইযে তারাগঞ্জ দেখা যায়।

কুলসুম চোখ বড় বড় করে পাট কলের চিমনি দেখে। ঘর বাড়ী দেখে, মানুষ জন দেখে। কিন্তু বাজানের কথা সে ভুলেনা।

আমি বাজানের কাছে যামু। আমি বাজানের কাছে যামু।

সবাই নৌকা থেকে নেমে পড়ে। ফতেমাও খোঁড়া পা নিয়ে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে কুলসুমের হাত ধরে নৌকা থেকে নামে।

ফাতেমা আকাশের সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সময়ের আন্দাজ করে। বোধ হয় নয়টা-দশটা বাজে। রোদের বেশ তেজ। একটা দোকানের ছায়ায় এসে বসে ফাতেমা, কুলসুমকে নিয়ে। রোজার দিনে দোকানপাট একটু দেরী করেই খুলে। দু-একটা দোকান সবে খুলছে।

কুলসুম ব্যাজার মুখে বসে আছে। কোন সাড়া শব্দ নাই অনেকক্ষন। দেখে বড় মায়া লাগে ফতেমার।

কিরে মা, কি হইছে? চুপচাপ ক্যান?

আমার ক্ষুধা পাইছে, খাইতে দেও। কাঁদতে কাঁদতে বলে কুলসুম।

সর্বনাশ, ফাতেমার সাথে খাবার দাবার, টাকা পয়সা কিছুই নাই। পোটলা পুটলি সব রমজানের সাথে। দু চোখে অন্ধকার দেখে সে। রমজান কখন আসবে কে জানে। ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখে, নৌকাটা এখনো ছাড়েনি। এটা ইজারার পারাপারের নৌকা। এটাই ফেরৎ যাবে আর আসবে। কতক্ষন লাগবে কে জানে।

ক্ষুধার ব্যাপারটা ওর মনেই ছিলনা। এখন ওর মনে হলো, ওর নিজেরও বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। পেটেরবা দোষ কি। পরশু সেহরীর পর থেকে পেটে কোন খাবার পড়েনি বললেই চলে।

কেমন করে সব ব্যাপার গুলো ঘটে গেল। কাল ইফতারের আগে আগে, সবে রমজান ভাটিখোলা থেকে ইটের ট্রাক নিয়ে ঘরে ফিরেছে। চৌধুরি সাহেবদের দালানের ইট। তখনি চৌধুরি সাহেবের কেয়ারটেকার জামিল ভাই, চৌধুরি সাহেবের জরুরী তলব নিয়ে হাজির।

রমজানরা দাদার আমল থেকে চৌধুরি সাহেবদের গ্রামের বাড়ীতে কাজ করে। ওনাদের আশ্রয়ে থাকে। চৌধুরি বাড়ীতেই রমজান বড় হয়েছে। কিছু লেখাপড়া শিখেছে। ওনাদের চাষের কাজ, বাড়ীঘরের দেখাশোনা করে সে।

মাস ছয়েক আগে ইমরান চৌধুরি রমজানকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এলেন ওনার নতুন দালানের কাজ দেখাশোনার জন্য। এসব কাজে একজান বিশ্বাসী লোক দরকার। দালানের ভিতের কাজ চলছে। দেখতে দেখতে একতলার ছাদ ঢালাই হলো। দোতালার কাজ শুরু হলো। সেই একতলা ঘরে, যন্ত্রপাতি আর সিমেন্টের বস্তার স্তুপের মাঝখানে রমজানের থাকার ব্যাবস্থা হলো। এক ফাকে রমজান গ্রাম থেকে ফাতেমা আর কুলসুমকেও নিয়ে এলো। রমজান মনের আনন্দে কাজ করে। স্বপ্ন দেখে, শহরে স্হায়ী ভাবে থাকতে পারলে কুলসমেকে মানষ করার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে ছটা মাস কেটে গেল। রমজান অনেক কিছু শিখে নিয়েছে ইতিমধ্যে। ইমরান চৌধুরির কেয়ার টেকার জামিল সাহেব আগে ইট, বালূ, সিমেন্ট - এসব কেনাকাটার কাজ সামলাতেন। এখন রমজানের ঘাড়ে সে দায়িত্ব পড়েছে।

জামিল সাহেব বলতেন, রমজান, ইট, বালূ, সিমেন্ট - এসব বড় ঝামেলার কাম। তুই এসব পারবি না। আর কাম কি এইসব গ্যাঞ্জামের মইধ্যে ডুইকা। জোগালীর কাম কর - ঝামেলা কম।

না না, পারুম জামিল ভাই। আপনে চিন্তা কইরেন না। জামিল সাহেবকে অভয় দেয় রমজান।

প্রথম প্রথম রমজানের কিছুটা অসুবিধা হতো। এখন বেশ সামলাতে পারে। জামিল সাহেব ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিতে পারছেননা, এটা ওনার হাবভাবে রমজান বুঝতে পারে।

জামিলের সাথে চৌধুরি সাহেবের সামনে যেতেই উনি চিৎকার করে উঠলেন, রমজান, তুই এক্ষনি আমার বাড়ী ছাইড়া যা।

রমজান চৌধুরি সাহেবের রাগের কারনটা ধরতে পারেনা। মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

তোরে বিশ্বাসী বইলা গেরাম থেইকা নিয়া আইলাম, ঘরে থাকতে দিলাম। শহরে আইসা ডানা গজাইছে। গুণ্ডাগো লগে যোগ দিয়া এখন আমার সর্বনাশ করার তালে লাগছ।

রমজান কিছুই বুঝতে পারেনা। আমি .. আমি .. কি করলাম চাচা? তোতলাতে তোতলাতে বলে রমজান।

তুই পিন্টুর সাথে মিলা আমাগো ওয়েল্ডিং মেশিন সরাছ নাই? শনিবার রাইতে হে আমাগো দালানে ঘুমাইছিলো না? রমজানের কথার পিঠে বলে উঠেন জামিল সাহেব। সারে কত পয়সা খরছ কইরা দামী মেশিন কিনা দিলো। তুই লোভ সামলাইতে পারলিনা। পিন্টুরে ডাকাইয়া আইনা জিনিষটা সরাইলি।

এইটা কি কইলেন জামিল ভাই! আমি কখন ...। কথা শেষ করতে পারেন রমজান।

ইফতারের সময় হইছে। আমার এখন প্যাচাল পাড়ার সময় নাই। আমার এক কথা। তুই এখনি আমার বাড়ী ছাইড়া যাবি। এই মুহুর্ত্তে। তোরে যদি আর এই মহল্লায় দেখি, আমি তোরে গুলি কইরা মারুম। জামিল, এই শয়তানডারে ঘর থেইকা বার করার দায়িত্ব তোমার। এক্ষনি বার করবা। সব ভাল মত চেক কইরা দেখবা যেন আর কিছু চুরি কইরা না নিতে পারে। বলে চৌধুরি সাহেব গট গট করে ভেতরে চলে যান।

রমজান হতভম্বের মত দাড়িয়ে থাকে।

যেমন কাম, তেমন ফল। এখন খাড়াইয়া থাইকা কি করবি। রমজানের হাত ধরে টান দিয়ে বেরিয়ে নিয়ে আসে জামিল সাহেব।

ওরা দুজন রমজানের ডেরার দিকে হাটতে থাকে।

রমজানের মনে পড়ে, শনিবার রাতে পিন্টু এসেছিল। পিন্টু পাড়ার উঠতি মাস্তান। রাতে যখন এলো, ওর চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। বোধহয় পুলিশ কিংবা অন্য দলের তাড়া খেয়েছে।

রমজান ভাই, রাইতটা আমারে থাকতে দেন। ভোরে সূর্য্য উঠার আগে চইলা যামু।

না না, সাবে জানলে আমারে কতল কইরা ফালাইবো।

কেউ জানবো না। আর আপনারে কতল করবো? আমারে খবর দিবেন। দেখুম আপনার সাবের ঘাড়ে কটা মাথা। আমার কথা বইলেন। কিছু করবোনা। গতবার আপনের সাবরে জানে বাচাইছিল কেডা? ইলেকশানে জিতাইল কেডা? আমি না থাকলে কই থাকতো আপনার সাব।

রমজানের নিজেরও ভয় লাগে।

এসব গূন্ডা পান্ডার দল, কি করতে কি করে বসে। এদের ঘাটানো ঠিকনা। অগত্যা রাজী হয় রমজান, এক সর্তে। ব্যাপারটা যেন কেউ না জানতে পারে।

না না, কেউ জানবো না। অভয় দেয় পিন্টু।

অবশ্য কথা রেখেছিল পিন্টু। রাতে একতলার ছাদে শুয়েছিল। ভোর হবার আগেই চলে গিয়েছিল। রমজান বুঝতে পারেনা, জামিল ভাই তবে ঘটনাটা জানল কি করে? তবে কি পিন্টু বলে দিয়েছে? না অন্য কেউ? যেইবা বলুক, ওর থাকার সাথে ওয়েল্ডিং মেশিন চুরির সম্পর্ক কি? সে ছিল শনিবার রাতে। এরপর পিন্টুকে দালনের ত্রিসীমানায় দেখেনি রমজান। শনিবার রাতে তো মেশিনটা চুরি হয়নি। রবিবারেও ওয়েল্ডিং মেশিনের কাজ হয়েছে। তা হলে ওকে দোষ দেয়া কেন?

জামিল ভাই, রবিবারেও তো ওয়েল্ডিং মেশিনের মিস্তিরিরা কাম করলো।

কে কখন কাম করলো না করলো, হেইডা দেইখা আমার লাভ কি? মেশিনডা যে চুরি গেছে, হেইডাই আসল কথা।

রমজান বুঝলো, কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। সে চুপচাপ হাটতে থাকে। রমজানের আস্তানার কাছে চলে এসেছে ওরা।

জামিল ভাই, আমারে বাঁচান। হঠাৎ জামিল সাহেবের হাত ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে রমজান।

রমজানের গলার শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ফাতেমা।

কত কইরা কইলাম, এইসব ইট-সিমেন্টের মইধ্যে ঢুকিসনা। জোগালীর কামে থাক, দারোয়ানের কামে থাক। কথা হুনলিনা। এখন যেমন কাম, তেমন ফল। এখন আমি কি করুম? তোরে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের চাকরী খামু নাকি? একঘণ্টা সময় দিলাম। যা লওয়ার লইয়া বাইর হ। না হইলে ওয়েল্ডিং মেশিন চুরির লাইগা আমি তোরে পুলিশে দিমু। ইফতার সাইরা নামাজ পইড়া আসার পর তোরে যেন এহানে আর না দেখি। সারা দিন রোজা রাখছি। একটু আল্লা- খোদার নাম নিমু, তারও উপায় নাই। কথাগুলো বলে বেরিয়ে যান জামিল সাহেব।

কি হইছে? প্রশ্ন করে ফাতেমা।

জামিল সাহেব যেতেই দু-চারজন লোক জড় হয়। সবাই প্রশ্ন করতে থাকে। রমজান কোন কথা বলে না। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পড়ে।

রমজান ঘরে ঢুকেই জিনিষপত্র গোছাতে থাকে।

আমি নাকি চৌধরী সাবের ওয়েল্ডিং মেশিন চুরি করছি। জান প্রান দিয়া কাম করলাম। শেষমেষ ফল পাইলাম এইডা। আমারে চইলা যাইতে কইছে। কইছে যখন, চইলা যামু। থাকুম ক্যান? এইডা কি আমার বাড়ী? আপন মনে গজ গজ করতে থাকে রমজান।

ফাতেমা ধরতে পারে, ব্যাপারটা কি।

আমি সাবের কাছে যামু, ওনার কাছে মাফ চামূ। ফাতেমা বলে।

খবরদার, ওই কথা মুখে আনবা না। দোষ করিনাই, মাফ চামু ক্যান? আমি এখনি ঘর ছাড়ুম।

যাইবা কই? থাকবা কই? খাইবা কি?

তুমিই ত কও, রিজিকের মালিক আল্লা। গেরামে চইলা যামু। আল্লায় একটা না একটা ব্যাবস্হা করবোই।

ফাতেমা রমজানকে চিনে। ওর মন উঠে গেছে এ যায়গা থেকে। শত চেষ্টা করেও ওকে আর এখানে রাখা যাবে না।

কিইবা আর জিনিষপত্র, গোছাতে বেশী সময় লাগে না। দুটো বোচকায় জিনিষপত্র বেধে সেগুলো নিয়ে বাইরে এসে বসে থাকে রমজান, ফাতেমা আর কুলসুমকে নিয়ে।
কি করে সবাই বুঝে গেছে, রমজানকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে চুরির অজুহাতে। পিন্টুকেও জড়ানো হয়েছে সাথে।

রমজান ভাই, আপনে যাইবেন না। আমি পিন্টু ভাইরে খবর দেই। পাড়ার একটা ছেলে বলে উঠে।

রমজান কোন কথা বলে না। ঠায় বসে বসে জামিল সাহেবের জন্য অপেক্ষা কারে।

যথাসময় জামিল সাহেব আসেন। রমজান কোন কথা না বলে চাবির গোছা এগিয়ে ধরে। জামিল সাহেব চাবি নিতেই রমজান মালপত্রের একটা বোচকা মাথায়, অন্যটি হাতে নিয়ে হাটতে থাকে। পেছনে ফাতেমা খোড়তে খোড়তে কুলসুমের হাত ধরে রমজানকে অনুসরন করে।

একটা রিকসা নেয় রমজান। সোজা সদরঘাট। লঞ্চ ছাড়তে ছাড়তে দুপর রাত পেরিয়ে যায়। ওরা পলাশপুর পৌছায় সূর্য্য উঠার পর। রমজানের নিজের কোন বাড়ীঘর নেই। ঠিক হয়েছে, পলাশপুর থেকে ওরা তারাগঞ্জ হয়ে ফাতেমার নানার বাড়ী হরিপুর যাবে আপাততঃ। ফাতেমার মা ও থাকে সেখানে।

সারারাত রমজান আর ফাতেমা কিছু খায়নি কাল সারাদিন রোজা রাখার পর। যা সামান্য খাবার সাথে ছিল, কুলসুম খেয়েছে।

ভট ভট শব্দ হচ্ছে। নৌকাটা ছেড়ে দিচ্ছে।

আমার ক্ষুদা লাগছে, খাওন দেও। কাঁদতে কাঁদতে বলে কুলসুম।

ফাতেমা উঠে। দেখা যাক, দোকান থেকে বাকীতে কিছু মুড়ি নেয়া যায় কি না। রমজানতো আসছেই একটুপর। তখন দাম শোধ করে দিলেই হলো। খোড়াতে খোড়াতে আগাতে থাকে সে, কুলসুমের হাত ধরে।

একটা খোলা দোকান দেখা যাচ্ছে। খাবার দাবার, পান বিড়ি, কলা সবই আছে। পায়ে পায়ে দোকানটার দিকে এগিয়ে যায় ওরা। দোকানের সামনে দাড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে

থাকে ফাতেমা। খাবারের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কুলসুম। বেশীক্ষন দাঁড়াতে পারেনা ওরা।

যা যা মাতারী, ভাগ। দিলি ত আমার বউনিটা বরবাদ কইরা। সারা রাত আকাম-কুকাম কইরা এই সক্কাল বেলা আর যাওনের যায়গা পাইলিনা। নাপাক শরীর লইয়া খাড়াইলি আমার দোকানের সামনে। যা যা, সর এখান থেইকা। বিরক্ত দোকানীর ধমক খেয়ে সরে আসে মা ও মেয়ে।

কষ্টে কান্না পেয়ে যায় ফাতেমার। একপা দু-পা করে নদীর ধার ঘেষে হাটতে থাকে ওরা। বেশী দুর যেতে সাহস হয়না। একটু পর রমজান আসছে। এসে যদি খুঁজে না পায়। একসময় নদীর ধারে বসে মা আর মেয়ে, দু-জনাই কাঁদতে থাকে।

কতক্ষন কেটেছে, কে জানে।

তুমি কেডাগো মা? কি হইছে? এক পৌড়া মহিলার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পায় ফাতেমা।

মাইয়াডার খিদা পাইছে। লগে কিছু নাই যে খাইতে দিমূ।

ফাতেমার পরনের কাপড় চোপড় দেখে মহিলার ধারনা, ওরা ভিক্ষুক নয়। হয়তো কোন বিপদে পড়েছে।

আস আমার লগে। এখানে কি কইরা আইলা?

ঢাকা থেইকা আইতাছি খালাম্মা। মাইয়ার বাপ আমাগো নৌকায় উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠতে পারলোনা মালপত্র লইয়া। পরের নৌকায় আইতাছে। এইদিকে মাইয়াডার লাগছে ক্ষুধা। আর, আমার লগে নাই টেকা-পয়সা।

ওরা পৌড়া মহিলার বাড়ী পৌছাল। কাছেই বাড়ী। দেখে মনে হয়, মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্ত। উনি একটা পলিথিন ব্যাগে কিছু মুড়ি আর পিঠা এনে ফাতেমার হাতে দিলেন। কৃতজ্ঞতায় ফাতেমা কেঁদে ফেললো।

খালাম্মা, আপনেরে আর কি কমু। আপনে আমারে বাঁচাইলেন। নামাজ পইড়া আপনার লাইগা দোয়া করুম। এখন ঘাটে যাই। মাইয়ার বাপের আহনের সময় হইয়া গেছে। আপনেও আমাগো লাইগা দোয়া কইরেন। বলে ওরা পথে নেমে আসে।

ফাতেমা হাটে। সাথে কুলসুম একটা পিঠা খেতে খেতে হাটতে থাকে। একটু পর ওরা ঘাটে পৌছে যায়। কুলসুম খাচ্ছে। ফাতেমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ওর ইচ্ছে করছে নদীতে নেমে আজলা ভরে পানি খেতে। কাজটা বে শরিয়তি হবেনা, তাও সে জানে। ইমাম জামাল উদ্দিনের মেয়ে সে। ছোট কাল থেকে বাবার কাছে কোরান হাদিশ শিখেছে, পনর বছর বয়স অবধি। সেই বছর ওর বাবা ইন্তেকাল করলেন। আর এমন পোড়া কপাল, সে বছরই চুলার আগুনে ওর দেহের এক অংশ পুড়ে সে বিকলাংগ হয়ে গেল। আগুনে ঝলসে গেল মুখের এক পাশ।

আব্বাজান বলতেন, আল্লা মানুষকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। এ' কেমন পরীক্ষা, ফাতেমা বুঝতে পারে না। বিকলাংগ বলে ওর বিয়ে হয়না। এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে। শেষে, চৌধুরী সাহেব রমজানকে রাজী করিয়ে ওর সাথে ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। রমজান গরীব হলেও ভাল মানুষ। কিছুটা লেখা পড়া জানে। মানুষ হিসাবে সৎ। চাচারা প্রথমে গরবাজী হলেও শেষে রাজী হয়ে গেলেনে। না হলে বিকলাংগ মুখপোড়া মেয়েকে বিয়ে করবে কে?

সফর কালে রোজা রাখা থেকে বিরত থাকা যায়। কিনতু আশে-পাশের মানুষগুলো কি তা বুঝবে? এমনিতেই ওরা কুলসুমের দিকে কটমট করে চাইছে। যেন সে কত বড় অন্যায় করে দিনের বেলা সবার চোখের সামনে খাচ্ছে।

বেশ অবসন্ন লাগছে ওর। ক্লান্তিতে দেহ ভেংগে আসছে।

পেটে কিছু পড়াতে কুলসুমের মুখ খুলেছে। আম্মা, দেখ দেখ, কত পাখী উড়াল দিয়া যাইতাছে। ওরা কই যায়? আমরা আবার কবে ঢাকা যামু? তুমি ত কইছিলা, আমারে চিড়িয়াখানায় নিয়া যাইবা। কই, নিলানা ত। এবার গেলে নিতে হইবো। রফিকের বিলাইডা সেদিন কি করলো যান? একটা পাখী ধরলো .....।

ফাতেমা শুনছে কি শুনছেনা। ওর চোখ বুজে আসছে একটু একটু করে।

আম্মা আম্মা, বাজান আইছে। কুলসুমের চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসে ফাতেমা।

নৌকাটা কখন ফেরৎ এসেছে, টের পায়নি সে। ওইযে রমজানকে দেখা যাচ্ছে। মাথায় একটা বোঝা, হাতে একটা। দুর থেকে একটা গাছের মত দেখাচ্ছে - চলন্ত গাছ।

কাছে এসে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে রমজান।

রমজানের চেহারা দেখে বড় মায়া হলো ফাতেমার। ইচ্ছা করলো, আঁচল দিয়ে ওর মুখটা মুছে দিতে। কিন্তু এত লোকজনের সামনে ওর সাহস হলো না।

শরীলডা আর চলতে চায়নারে বউ।

হঠাৎ খাবারের দিকে নজর পড়ে রমজানের। খাওন পাইলা কই?

আল্লায় যোগাড় কইরা দিছে। ফাতেমার উত্তর।

আমার ক্ষুধা লাগছে। রমজান বলে।

আমার ও। ফাতেমাও বলে। চল, মানুষ জনের সামনে থেইকা, একটু আড়ে।

ওরা হাটতে থাকে। নদীর পাড়ে, একটা ঝোপের আড়ালে থামে ওরা। উপর থেকে যায়গাটা দেখা যায় না। নদী থেকে দেখা যায় বটে, তবে নদীতে নৌকার চলাচল তেমন নাই। আকাশে গন গনে সূর্য্য। ওরা ওকটা গাছের ছায়ায় বসে।

পোটলা খুলে জগ বের করে নদী থেকে পানি আনে রমজান। ঢক ঢক করে পানি খায়। ফাতেমাও খায়। কুলসুম অবাক হয়ে বাবা-মার কান্ডকারখানা দেখে।

গলাডা একবারে শুকাইয়া গেছিলো। পোটলা থেকে মুড়ি খেতে খেতে বলে রমজান।

আম্মা, মানুষরে ডরাও আর আল্লারে ডরাও না? মানুষগো কাছ থেইকা লুকাইয়া খাইতাছ। কিন্তু তুমিই ত কও আল্লা সব দেখে। এখন যে খাইতাছ, আল্লা দেখবো না?

ফাতেমা সবে একটা পিঠা ভেংগে মুখে দিতে যাচ্ছিল, কুলসুমের প্রশ্ন শুনে মুখে আর তা আর দেয়া হয়না।

নারে মা, আল্লারে ডরামু ক্যান। আল্লা হইলো রহমানুর রহিম, পরম দয়ালু। ওনার দয়ার শেষ নাই। বুঝবিনা, তবুও কই। তোর নানাও আমারে না বুঝার বয়স থেইকা সব কইতো। আল্লা বিচার করে সব জাইনা শুইনা। তাই তারে ডর নাই। ডরাই মানুষরে, কারন হেরা বিচার করে কিছু না জাইনা, আধা জাইনা, ভুল জাইনা।

July-September, 2008